বিজ্ঞান আন্বেষক -এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো: ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘন্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৫ | সংখ্যা ৫ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর /২০০৮ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

বিচিত্রপ্রাণী

শামুক : খোলসযুক্ত প্রাণী। এই খোলস অনেকটা পাকানো অবস্থায় থাকে। এটা থাকে শামুকের পিঠের উপর। পৃথিবীতে প্রায় ৮০ হাজার বিভিন্ন ধরনের শামুক আছে। কিছু শামুক জলে, কিছু স্থলে আবার কিছু বাস করে সমুদ্রে।

বেশিরভাগ শামুকই আকারে ৩ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় হয় না। সবচেয়ে বড়ো আকারের শামুক হয় ২০ সেমি। অনেক অঞ্চলে শামুক মানুষের খাদ্য।

শ্লথ : এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী, যাদের বাস দক্ষিণ আমেরিকায়। এরা সবাই খুবই ধীরগতিতে চলে। এরা প্রধানত নিশাচর। সারা জীবনই গাছে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকতে অভ্যস্ত। এদের খাদ্য হল গাছের পাতা, কুঁড়ি আর বীজ। এদের দেহের লোমে সবুজ শ্যাওলা দেখা যায়। দুধরনের শ্লথ দেখা যায়, দুটি পায়ের নখ ও তিনটি নখযুক্ত।

শৃগাল বা শিয়াল : কুকুর প্রজাতির প্রাণী। সাধারণ শৃগাল হল লাল শৃগাল, যাদের দেখা যায় — ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা আর এশিয়ার কোনো কোনো জায়গায়। এদের খাদ্য হল ছোট

এর পর ৭ পাতায়

সাপের টুকিটাকি

সাপ (Snake) পৃথিবীর বিচিত্রতম জীব। মাত্র দু' অক্ষর দিয়ে তৈরি 'সাপ' কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথে সাধারণত আমাদের সারা দেহ শিউরে ওঠে। অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী এই প্রাণীটি এতটাই ভীতি সৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত — অন্তত বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। যদিও সাপ প্রাণীটি ভীষণ নিরীহ এবং শীতলরক্ত যুক্ত। এরা অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষসহ অন্যান্য শিকারী প্রাণীদের শিকার হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আমাদের দেশেই মানুষ মারা যান সর্পাঘাত জনিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণে। অথচ পৃথিবীতে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই অনেক (শতকরা ৮৫ ভাগ) বেশি, বিষধর সাপের তুলনায়। আবার, সাপে কামড়ানোর ঘটনার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই ঘটে নির্বিষ সাপ থেকে। একটি সমীক্ষা বলছে, বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সেরকম কোন বিষক্রিয়া হয় না। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, যে প্রতি ১০টি কেউটে কামড়ানো রোগীর মধ্যে মারা যাবার সম্ভাবনা মাত্র ১ জনের।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, যে ভারতে গড়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সাপ জনিত কারণে প্রতিবছর প্রায় ২৫,০০০ মানুষ মারা যান। এক্ষেত্রে, বেশিরভাগ মৃত্যুই হয় ভুল চিকিৎসা, কু-সংস্কার ও সাধারণ মানুষের সাপ সম্পর্কে সঠিক ধ্যানধারণা না থাকায় — অথচ পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিষধর সাপের বাস।

জীবজগতে সাপের অবস্থান

সাপ সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি প্রাণী। এই প্রাণীরা তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য সরীসৃপ শ্রেণীর অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে নিজেকে কিছুটা সরিয়ে রেখে একটি নির্দিষ্ট বিভাগ গঠন করতে সক্ষম হয়েছে।

সরীসৃপ (Reptilia) শ্রেণীর অন্তর্গত 'স্কোয়ামাটা (squamata)' বর্গের অধীন 'অফিডিয়া (Ophidia)' উপবর্গের প্রাণী হচ্ছে এই সাপ।

সাপের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ

সাপকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— বিষধর সাপ ও নির্বিষ সাপ। বিষধর সাপ আবার দু'রকম— ক্ষীণবিষযুক্ত (যেমন- লাউডগা, কালনাগিনী, মেটেলি সাপ প্রভৃতি) ও উগ্রবিষযুক্ত।

উগ্রবিষযুক্ত সাপ আবার দু'ধরনের হয়— ফণাধর (কেউটে, গোখরো/গোমা, শঙ্খচূড়) ও ফণাবিহীন কালাচ, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি)।

সাপের অতীত ও বর্তমান

সাপ উভচর প্রাণীর পরবর্তী অন্ততঃ ১০ কোটি বছর পরে কার্বোনিফেরাস যুগে আবির্ভূত হয়। পরবর্তীকালে মেসোজোইক যুগে

এর পর ২ পাতায়

সার্ধ শতবর্ষে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

শক্তির দেওয়া নেওয়া ও বিকিরণ অবিরত ও অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় ঝাঁকে ঝাঁকে (By jerks), অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খন্ড খন্ডভাবে (Discontinuously) অর্থাৎ কণাভাবে। কোন তরঙ্গের শক্তি কখনও ন্যূনতম একটি সংখ্যার চেয়ে কম হতে পারে না। কথাগুলি বলতে পেরেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) এবং এই কথাগুলিই প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (Quantum Theory)-এর মূল কথা। বর্তমান পদার্থ বিদ্যা যে দুটি মূল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার একটি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relativity), অপরটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান (Quantum Mechanics)। এই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বিশাল ইমারৎটি গড়ে উঠেছে প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক জন্মেছিলেন ১৮৫৮ সালের ২৩ এপ্রিল। জার্মানীর কিয়েল শহরে এক উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে। তাঁর পুরো নাম ম্যাক্স কার্ল আর্নস্ট লুডউইগ প্ল্যাঙ্ক (Max Karl Ernst Ludwing Planik) পিতা জুলিয়াস

এর পর ৫ পাতায়

সাপ

১ পাতার পর

পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই যুগকেই সরীসৃপদের স্বর্ণযুগ বলে।

প্রাচীনকাল থেকে কি ধর্মীয় কি রাজনৈতিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সাপ আমাদের সমাজ জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পুরান, কোরান, বাইবেল, ইলিয়াড, ওডিসি সর্বত্রই সাপের উল্লেখ আছে। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', আধুনিক যুগের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও সাপের অসংখ্য কাহিনীর কথা উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন লেখক, কবির কল্পকাহিনী, কবিতা প্রভৃতিতেও সাপের যথেষ্ট পরিচিতির উল্লেখ আছে।

এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বে প্রায় ৬০০০ প্রজাতির সরীসৃপ বেঁচে রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ২৯০০ প্রজাতির সাপই রয়েছে — ১৮টি পরিবারের সদস্য হিসেবে। এর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় ৩০০ প্রজাতির সাপের দেখা মেলে।

অতীতে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কেবলমাত্র ডাইনোসররাই ছিল দীর্ঘাকার, বিশালাকার, বর্তমান পৃথিবীতে সরীসৃপদের মধ্যে সাপ দীর্ঘদেহী।

সাপ সম্বন্ধীয় কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য

পৃথিবীর দীর্ঘতম সাপ — গ্রীন অ্যানাকোন্ডা যা দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদ থেকে শুরু করে প্যারাগুয়ে পর্যন্ত পাওয়া যায় বিশেষ করে ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে। দৈর্ঘ্যে গড়ে প্রায় ৩৫ ফুটের ওপরে হয়। পুরানো রিপোর্টে ৪৯ ফুট এমনকি ৮২ ফুট দৈর্ঘ্যেরও উল্লেখ রয়েছে।

ভারতের দীর্ঘতম সাপ ঃ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের দীর্ঘতম সাপ হচ্ছে ভারতীয় অজগর বা Python molutus যার গড় দৈর্ঘ্য ৩০-৩২ ফুট হয়।

সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সাপ ঃ পুঁয়ে সাপ / অন্ধসাপ (Leptotyphlops spp) যার দৈর্ঘ্য ৮-১০ ইঞ্চির বেশি হয় না।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিষধর সাপ ঃ পেনিনসুলার টাইগার সাপ (Peninsular Tiger Snake– Notechis scutatus) যা অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়।

বিষধর সামুদ্রিক সাপ ঃ হাইড্রোফিস বেক বেকি (Hydrophis bech beichei)

ভারতের সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত সাপ ঃ শঙ্খচূড় বা কিং কোবরা (King Cobra)

যে দেশে / দ্বীপে একটিও সাপ নেই ঃ হাওয়াই দ্বীপ (Hawai Island)

সাপের গড় আয়ু ঃ প্রজাতিভেদে ভিন্ন। তবে, সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর এরা বাঁচে।

যে সাপ ডিম পারে না বা সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে — চন্দ্রবোড়া, বালিবোড়া প্রভৃতি।

সাপের খাদ্য ঃ এরা সাধারণত অতিক্ষুদ্র পিঁপড়ের ডিম থেকে শুরু করে গরু-মোষের বাচ্চা হরিণ এমনকি চিতা বাঘ, বণ্য শুকর পর্যন্ত খেতে পছন্দ করে।

গর্তবাসী ছোট ছোট অন্ধ সাপেরা (পুঁয়ে সাপ প্রভৃতি) প্রধানত পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ের ডিম খায়। এছাড়া উই, পিঁপড়ে, কেঁচো প্রভৃতি খেতেও এরা পটু। জলঢোড়া, মেন্টেলি প্রভৃতিরা প্রধানত মাছ, ব্যাঙাচি ও ছোট ছোট ব্যাঙ খায়। চন্দ্রবোড়া, দাঁড়াশ প্রভৃতি সাপ সাধারণত কীটপতঙ্গ, কাঁকড়া, কাঁকড়া বিছা, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, পাখি ও ডিম, ইঁদুর প্রভৃতি খায়। শঙ্খচূড় ও শঙ্খিনী/শাঁখামুটি প্রধানত সাপই খায়। আবার, কিছু সাপ আছে যারা শুধুমাত্র বিষধর সাপ খায় (আমেরিকার — মুসুরানা প্রজাতির সাপ)। অবশ্য চন্দ্রবোড়া অনেক সময় নিজের বাচ্চাকে খেয়ে নেয়।

একনজরে বাংলার সাপ

বাংলাতে অজস্র প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়, যার মধ্যে নির্বিষ ও বিষধর উভয়ই রয়েছে। নিচে তালিকা আকারে এদের সাধারণ বাংলা, সাধারণ সম্ভাব্য ইংরাজী নাম ও বিজ্ঞানসম্মত নাম দেওয়া হল —

নির্বিষ সাপ

সাধারণ বাংলা নাম	সাধারণ ইংরাজী নাম	(বিজ্ঞানসম্মত নাম)
• পুঁয়ে সাপ	Blind Snake	*(Typhlops braminus)*
• হেলে সাপ	Buff Stripped keel back	*(Natrix stolata)*
• ঢোঁড়া সাপ	Checkered Keel back	*(Natrix piscator)*
• বেত আঁচড়া	Bronze back Tree Snake	*(Ahactulla grandocullis)*
• তিনদাগী সাপ	Copper headed Trinket Snake	*(Coelognathus radiatus)*
• ঘরচিতি	Common wolf Snake	*(Olygodon venustus)*
• বালিবোড়া	Blunt failed Sand Boa	*(Etyx conicus)*
• তুতুর	Rough Scaled Sand Boa	*(Etyx joni)*
• দাঁড়াশ	Rat Snake	*(Ptyas mulosus)*
• ভারতীয় অজগর	Indian Python	*(Python molutus)*
• মেন্টেলি	Indian Egg Eater	*(Elachistodon westermanni)*

সামান্য বিষযুক্ত সাপ

• লাউডগা	Vine Snake	*(Dryophis nasutus)*
• কালনাগিনী	Flying Snake	*(Chrysopelea ornata)*
• গাংমেটে	Dog Faced water Snake	*(Cereberas phynchops)*

উগ্র বিষযুক্ত সাপ

• শঙ্খচূড়	King Cobra	*(Ophiophagus hannah)*
• গোখরো/গোমা	Common Cobra	*(Naja naja)*
• কেউটে	Indian Cobra	*(Naja naja kaouthia)*
• কালাচ	Common Krait	*(Bungarus caeruleus)*
• শাঁখামুটি/শঙ্খিনী	Banded Krait	*(Bungarus fasciatus)*
• চন্দ্রবোড়া	Russel's viper	*(Vipera russelli)*
• গেখে বোড়া	Pit viper/ Green tree vipet	*(Trimetesurus glamineus)*

সাপের বিষ

সাপ মাত্রই 'বিষাক্ত' বা 'ক্ষতিকারক' এই ধারণা যেমন ভুল, আবার, সাম্প্রতিককালে এও প্রমাণিত যে বিষ বা 'Venom' সমস্ত সাপেরই থাকে — কম আর বেশি। ফারাক এক জায়গায় তা হল — তথাকথিত

এরপর ৩ পাতায়

সাপ

২ পাতার পর

'বিষাক্ত' সাপে অধিক মাত্রায় বিষের এবং বিষদাঁত (Fang) এর উপস্থিতি তাদেরকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে — বলতে গেলে এরাই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বলাবাহুল্য, যেসমস্ত সাপে খুব অল্পমাত্রায় বিষ থাকে এবং যাদের বিষ নিষ্ক্রমণের জন্য কোনরকম 'বিষদাঁত' থাকে না ... তাদেরকেই আমরা 'নির্বিষ' সাপ হিসেবে ধরি ... যারা কখনই ক্ষতি করে না।

সাপের 'বিষ' আদতে উৎসেচক সমেত দুই বা ততোধিক প্রোটিনের মিশ্রণ। অম্লধর্মী এই বিষে ভারী আণবিক গুরুত্বের উৎসেচক ও প্রোটিন অণুর সাথে কিছু পরিমাণে তামা (Cu), গন্ধক (S), দস্তা (Zn), অ্যান্টিমনি (Sb), আর্সেনিক (AS) প্রভৃতি মৌল উপস্থিত। উৎসেচকগুলোর মধ্যে প্রধানত প্রোটিনেজ, হায়ালুরোনিডেজ, ট্রান্স অ্যামিনেজ, অ্যাসিড ফসফাটেজ, এক্সোপেপটাইডেজ প্রভৃতি উপস্থিত। এছাড়া এর মধ্যে কিছু অধিবিষ (Toxin) উপস্থিত যথা — নিউরোটক্সিন, হিমোটক্সিন, মায়োটক্সিন ইত্যাদি। এই অধিবিষগুলোই লাল রক্ত কনিকা গুলোকে নষ্ট করে ফলে রক্তের শ্বাসবায়ু (O_2 ও CO_2) পরিবহন ক্ষমতা বিনষ্ট হয় — ফলস্বরূপ, শ্বাসকষ্টে রোগী মারা যান। অন্যদিকে, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কাজ করে, একে অকেজো করে তোলে। উপরিউক্ত ধর্মের ওপর নির্ভর করে, সাপের বিষকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা — হিমোটক্সিক (Haemotoxic) এবং নিউরোটক্সিক (Neurotoxic)। ভাইপার জাতীয় সাপের বিষ হিমোটক্সিক প্রকৃতির, অপরপক্ষে গোক্ষুর বা কোব্রা জাতীয় সাপের বিষ 'নিউরোটক্সিক যা স্নায়বিক তন্ত্রের উপর কাজ করে। ভাইপার জাতীয় সাপের বিষ (চন্দ্রবোড়া, গেছোবোড়া প্রভৃতি) রক্ত সংবহন তন্ত্রের ওপর কাজ করে।

সাধারণতভাবে, সাপের বিষ সাপের খাদ্য পাচনে সাহায্য করে। উচ্চ আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রোটিন সমৃদ্ধ 'বিষ'কে আমাদের খাদ্যের প্রোটিন ভঙ্গক উৎসেচক হিসেবে ব্যবহার করাই যায় — শর্ত হচ্ছে আমাদের খাদ্যনালীতে কোন ক্ষত রাখা চলবে না। ঋতুভেদে বিষের সান্দ্রতা (Viscocity) হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এর তীব্রতারও হেরফের হয়। প্রাণীভেদে প্রতিরোধ ক্ষমতা আবার বিভিন্নরকম। বিড়াল, ব্যাঙ প্রভৃতি বেশিমাত্রায় বিষ সহ্য করতে পারে। বেজি মানুষের চাইতে অন্তত ১০ গুণ বেশি বিষ সহ্য করতে পারে। সাপের বিষ সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পর্যাপ্ত পরিমাণে বিষ ঢালতে না পারলে তেমন মারাত্মক বিষক্রিয়া হয় না। এই বিষ ঢালতেও সাপেদের প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ দরকার যা সবসময় পাওয়া যায় না।

নির্বিষ ও বিষধর সাপের ক্ষতচিহ্নের পার্থক্য

নির্বিষ কিংবা বিষধর সাপে কামড় দিলে ক্ষতস্থানের চিহ্ন দেখে সহজেই বোঝা যাবে যে, সাপটি বিষধর না নির্বিষ এবং সেই বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে : নির্বিষ সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দাঁতের সারি সমান্তরালভাবে পাওয়া যায়। স্থানটি সহজে ফুলে ওঠে না।

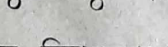

নির্বিষ সাপের বেলায় ক্ষতচিহ্ন

বিষধর সাপের ক্ষেত্রে : বিষাক্ত সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানটি তৎক্ষণাৎ ফুলে উঠবে। ক্ষতস্থানে এক বা দুটি বড় বড় ক্ষত চিহ্ন থাকবে, রক্ত ঝড়বে। সাথে আনুষঙ্গিক উপসর্গ তো থাকবেই। দাঁতের কোন সমান্তরাল সারি পাওয়া যায় না। দুটি চিহ্নের মাঝখানে মোটামুটি ১ ইঞ্চি ফারাক থাকে।

বিষাক্ত সাপের বেলায় ক্ষতচিহ্ন

এটা খুব সত্য যে আজও সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীন এলাকায় বসবাসকারী মানুষ অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা (চিকিৎসা) গ্রহণ করতে পারেন না। নির্ভর করতে হয় ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাক্ প্রভৃতির উপর। পরিণতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটে।

সাপে কামড়ালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া দরকার

- সর্পাহত রোগীকে নড়তে চড়তে দেওয়া উচিৎ নয়। ক্রমাগত সাহস দিয়ে যেতে হবে।
- যত দ্রুত সম্ভব একটা শক্ত বাঁধন দিতে হবে, হাতে কামড়ালে বাহুর মাঝখানে, পায়ে কামড়ালে উরুর যত ওপরে সম্ভব।

মনে রাখতে হবে, বাঁধন দেওয়াটা খুব বেশি বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ, বাঁধন দিলেও বিষ রক্তের সাথে বেশ ভালো বেগেই মিশে যায়। অনেক ক্ষেত্রে, উল্টে ফলই হয় — শক্ত বাঁধনের জন্য দেহ কোষে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় ফলে বিষ রক্তে বেশি মেশার সুযোগ পায়। এছাড়া 'গ্যাংগ্রিন' হয়ে জায়গাটিতে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাঁধন দেওয়াটা শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রোগীকে শক্তি জোগায় মাত্র। বাঁধন দিলেও ২০ মিনিট অন্তর ২-৩ মিনিটের জন্য খুলে দিতে হবে। আবার, কোনমতেই দেড় ঘণ্টার বেশি রাখা চলবে না।

- কামড়ানো জায়গাটা কখনই কাটা, চেরা উচিৎ নয়।
- ক্ষতস্থান থেকে বিষ টেনে আনার রীতি সোনালী ও রুপোলী পর্দায় মাঝে মধ্যে ভেসে উঠলেও বাস্তবে এই পদ্ধতি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- কামড়ানো জায়গাটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে হাল্কা ব্যান্ডেজ বাঁধা যেতে পারে। তারপরই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে রোগীকে নিকটবর্তী কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে (যেখানে অ্যান্টিভেনিন মজুত আছে) নিয়ে যেতে হবে।

সাপ সংরক্ষণ করাটা কেন জরুরী

সাপের গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সাপ আমাদের এবং প্রতিটি জীবের নানানভাবে উপকারে আসে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

— রাজা রাউত, ০৩৫৬১-২৭৭১৯৯/ ৯৪৭৪৪১৭১১৭৮

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ

আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্র; সুশ্রুত সেবা সংঘ কোচবিহার
বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম; বাদুরবাগান চৌপথী কোচবিহার।
সেন ফার্মেসী, আলিপুরদুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি।
জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, জলপাইগুড়ি।

'সাপের কামড়ের সমস্যা কি আদৌ কোনো সমস্যা'?

দ্রলোক লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন করেন তিনি ভাবেন লিটল ম্যাগাজিন না থাকলে মানুষ হয়তো বাঁচবে না। এরকম ভাবনা যিনি নারী নিয়ে কিংবা পরিবেশ অথবা পশু কিংবা প্লাস্টিক অথবা শৌচাগার নিয়ে আন্দোলন করেন ভাবনাটা সবার ক্ষেত্রে একইরকম। যিনি যে আন্দোলন করেন তিনি প্রকৃত অর্থে যত গভীরে ঢুকতে যাবেন ততই সেই আন্দোলনের নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করতে থাকেন। আমি এই বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত হই ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে। তখন থেকেই আমার উপলব্ধিতে যা প্রকাশ পায় তা হল এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খুব সাধারণ ছেলেমেয়েরা এত অসাধারণ ভাবছে তা আমাকে বিস্মিত করে। সব কাজকর্ম করেও ধারাবাহিকভাবে ছোট ছোট কাজগুলোকে একসাথে করলে যা দাঁড়ায় তা যেন ভাবনারও অতীত। খুঁজে পাই এই বিজ্ঞান আন্দোলনের ইনার স্ট্রেংথ (Inner Strength)। শুরু হয় সাপের কামড় নিয়ে পথ চলা। সালটা ১৯৯৫, ততদিনে আমরা চাকদহ ব্লকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে একটা দারুণ সমীক্ষা করে ফেলেছি। গরমের শুরু, বর্ষার শেষ, শীতের শুরু বছরে এই ৭-৮ মাসে চাকদহ ব্লকে সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছেন ১১৪ জন মানুষ। কথাটা তৎকালীন B.D.O. দেবাহুতি চট্টোপাধ্যায়কে বলতেই উনি অবাক। একটা ইংরেজ শব্দ ব্যবহার করেন 'Is it true?' আমি তো ভাবতাম এই সাপের কামড়ের সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। ডায়েরিয়াতে পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ মারা যান। আপনারা গল্প বলছেন না তো? আমরা লিখিতভাবে যিনি মারা গেছেন তাঁর নাম, কোন গ্রামে, কোন পঞ্চায়েত, কোন মৌজা, কবে কামড়, কোথায় কামড়, কোন ওঝাকে দেখিয়েছে, কখন হাসপাতাল এবং কখন মৃত এইসব তথ্য সম্বলিত একটি চিঠি দেওয়ার চারদিন পর B.D.O. -র তলব। সত্যি আপনারা দারুণ একটা তথ্য তুলে ধরেছেন। S.D.O.-র কাছেও এই তথ্য নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন, আপনারা কী পুরাতন নকশালপন্থী ছেলে? আমরা বলি কাজটা ১৯৮৮ সাল থেকে ওরা শুরু করেছিল বটে, তবে এটি একটি সমস্যা তা সরকার স্বীকার করেনি। তার কারণ আমাদের মনে হয়েছিল সঠিক পরিসংখ্যান তখন ওদের হাতে ছিল না। তাই আমরা একটি ছোট বিজ্ঞান সংগঠন মনে হয়েছে এটি একটি সমস্যা তাই কাজটা করছি। উনি খুব খুশি হয়ে ওনার গাড়িটা ব্যবহারের অনুমতি দিলেও আমরা বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করি। এর মধ্যে আমরা চাকদহের সমস্ত শিক্ষাবিদ সমস্ত দলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এবং ডাক্তারবাবুদের নিয়ে একটা কনভেনশন করে ফেলেছি। এ কনভেনশনের মধ্যে থেকে একটা বিতর্ক আমাদের সংগঠনের ছেলেদের মধ্যে উঠে আসে। আমরা গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে শুধু কু-সংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করব আর বলব ওঝা-গুনীন কোরো না। নাকি পাশাপাশি সরকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত যে অব্যবস্থা এবং A.V.S. নেই হাসপাতালে তার দাবী করব। সেই সময় এগিয়ে থাকা বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মীগণ বললেন বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ হল মানুষকে সচেতন করা। ব্যাস তারপর মানুষ ঠিক করে নেবে তার পথ। বাকি A.V.S.-র আন্দোলন করবে রাজনৈতিক দল। আর একদল কম বোঝা বিজ্ঞানকর্মী বললেন তা হলে কী করে হবে? আমরা সচেতন করবার পর বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে আধুনিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে বলব, গিয়ে দেখবে A.V.S. নেই এ কেমন দায়িত্বহীন আন্দোলন। আমরা এর মধ্যে নেই। সংগঠন প্রায় ভেঙে যায়। তখন ঠিক হল, ঠিক আছে একদল সচেতনতার কাজ করবে আর একদল হাসপাতাল মুভমেন্ট। শুরু হল ধারাবাহিক কাজ। ডাক্তারদের রোষ্টারের মত আমরা একটা রোষ্টার করলাম এবং শুরু হল হাসপাতালে যাওয়া। এর মধ্যে (সালটা ১৯৯৭) তৎকালীন স্বাস্থমন্ত্রী পার্থ দে চাকদহ হাসপাতাল পরিদর্শন করছেন শুনে আমরা গোটা দশেক বিজ্ঞানকর্মী গিয়ে উপস্থিত। পারিষদদের টপকে অনেক কষ্টে ওনার কাছে পৌঁছে বললাম আপনার সাথে কিছু সমস্যার কথা বলতে চাই। উনি শিক্ষকের স্টাইলে বললেন, 'তিন মিনিটের মধ্যে বলতে হবে। আমি হাসপাতাল পরিদর্শন করে এসে কথা বলব।' ঘুরে এসে আমাদের সাথে একটা ঘরে বসলেন, আমরা আমাদের দাবীপত্র ওনার হাতে দিলাম এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিলাম। উনি B.D.O. এবং হাসপাতাল সুপারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সভাপতির সাথে কথা বললেন তারপর C.M.O.H. কে বললেন হাসপাতালে যাতে A.V.S. মজুত থাকে এবং C.M.O.H. যাতে আমাদের কথা শোনেন তাও বললেন।

ব্যাস শুরু হল চাকদহ হাসপাতালে A.V.S. দেওয়া। প্রথম ইন্ডেন নিয়ে গিয়ে আমরা হাসপাতালে A.V.S. এনে দিই। তারপরে চাকদহ হাসপাতালে আমাদের দাবী অনুযায়ী একটা A.V.S. Register তৈরী হয়েছে যা থেকে চাকদহ ব্লকের যেকোনো মানুষ বুঝতে পারবেন কজন ভালো হয়ে গিয়েছেন আর কতগুলো A.V.S. হাসপাতালে মজুত আছে। এরপর ডাক্তারবাবুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া— কোনো রোগী এই চিকিৎসা চালাতে গিয়ে মারা যান তবে আমরা আগে মারা যাব তারপর আপনারা। আজ সেই ডাক্তারবাবুরা কেউ আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত, কেউ বা এন আর এস-এ মাইক্রোবায়োলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এখন এই পণ্য চিকিৎসার দুনিয়ায় তাঁরা মানবিক। সাপের মেলা খেদাইতলায় আসা ওঝা, বেদে, গুণীনরা বলছেন এখন আর ওঝা নয়, হাসপাতালে যান। শুধু সাপের কামড়ের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে চাকদহ হাসপাতালে রোজ আউটডোরে ৫০০ রোগীকে (মানুষকে) হাসপাতালমুখী করা সম্ভব হয়েছে।

তাই এই পণ্য দুনিয়ায় বিজ্ঞান আন্দোলনের যৌক্তিকতা আরো বাড়ছে। আমরা দেখেছি শুধু দারিদ্রতার মধ্যে দিয়েই প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে না। চাই সঠিক সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। আজকে এই আন্দোলনের কাজটায় আমাদের সংগঠনের গুটি কয়েক কর্মী নয়, রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, দোকানদার, মৎস্যজীবী, গ্রামের কৃষক, সমস্ত ক্লাব এমনকি প্রধান রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলও এর গুরুত্ব অনুভব করেছেন। আমরা দেখেছি বহু ভাববাদী সংগঠন যাঁরা আমাদের একেবারেই পছন্দ করেন না তাঁরাও এই আন্দোলনে সামিল। আসলে সামগ্রিকভাবে এটাই বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ হওয়া উচিত। এখন শুধু A.V.S. নয়, চাই কুকুরের কামড়ের ঔষধ, চাই আর্সেনিক ক্লিনিক, গরীব মানুষকে কম দামের ঔষধ লেখা, ডাক্তারবাবুরা যাতে হাসপাতালে তাঁর ডিউটি ঠিকমতন করেন সব কিছুই দাবী এখন বিজ্ঞান সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, চাকদহ ব্লকের সব মানুষের দাবীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। আন্দোলন ও পাঠচক্র বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের মূল কর্মসূচী হওয়া উচিত।

— বিবর্তন ভট্টাচার্য, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ৯৪৩৪১১০৯৬৯

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

১ পাতার পর

ভিলহেলম ফন প্ল্যাঙ্ক, মাতা এম্মা প্যাৎজিগ। এম্মা ছিলেন জুলিয়াসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। জুলিয়াসের প্রথম পত্নী ছিলেন ম্যাথিলডে ভোইগ্‌ৎ। ম্যাক্সের মোট ছয়জন ভাইবোন একসঙ্গে থাকতেন। পরিবারটি ছিল বড়, একান্নবর্তী। পরিবারটিতে ছিল পান্ডিত্য, সততা ও সহৃদয়তার ঐতিহ্য। ম্যাক্স এসব গুণাবলী লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর কর্মজীবনে এসবের প্রতিফলন ঘটেছে।

ম্যাক্সের ছাত্রজীবন শুরু হয় কিয়েলের স্কুলে। ১৮৬৭ সালের মে মাসে ম্যাক্স ভর্তি হন বিখ্যাত ম্যাকসিমিলিয়ান জিমনাসিয়ামে। এই জিমনাসিয়ামটি ছিল ম্যাক্সের প্রিয় মাধ্যমিক স্কুল। পরীক্ষার ফল ভালোই করতেন ম্যাক্স কিন্তু অসাধারণ হতো না। অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞানে ম্যাক্স মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। স্কুলে তৃতীয় থেকে অষ্টম স্থানের মধ্যে থাকতো তাঁর অবস্থান। কিন্তু সঙ্গীতে ম্যাক্স খুব ভালো ফল করতেন। তিনি খুব ভালো পিয়ানো ও অর্গ্যান বাজাতে পারতেন। ১৮৭৪ সালের জুলাই মাসে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করলেন। ঐ বছরের অক্টোবরে তিনি মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। কলেজ জীবনের শুরুতে ম্যাক্স খুব আগ্রহের সঙ্গে অঙ্কের ক্লাসগুলিতে হাজির থাকতেন। সে সময় নিউনিখের অধ্যাপক ফিলিপ ফন জোলি ম্যাক্সকে বলেছিলেন, পদার্থবিজ্ঞান একটি পূর্ণবিজ্ঞান, এর আর খুব একটা অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। অবশ্য কেবল অধ্যাপক ফিলিপ নন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণাই ছিল যে, পদার্থ বিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। পদার্থ বিজ্ঞানে নতুন করে কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা কিংবা গবেষণা করা অর্থহীন। কিন্তু অধ্যাপক ফিলিপের কথা ম্যাক্সকে নিরুৎসাহিত করতে পারে নি। ম্যাক্স পদার্থবিজ্ঞান নিয়েই পড়াশোনা শুরু করলেন। ১৮৭৭ সালে ম্যাক্স কিছুদিনের জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। এখানে তিনি ভিয়েরস্টাস, হেলমহোলৎজ এবং কিরকফ্-এর মতো বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের অধ্যাপক হিসাবে পান। এঁরা ম্যাক্সকে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। ১৮৭৯ সালে ম্যাক্স মিউনিখে ফিরে আসেন। ঐ বছর জুলাই মাসে ২১ বছর বয়সে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাক্স ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ম্যাক্সের গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল 'On the second law of mechanical theory of heat'।

১৮৮৫ সালের ২ মে প্ল্যাঙ্ক কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে প্ল্যাঙ্ক তাপগতিবিদ্যার উপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর প্ল্যাঙ্ক বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং একই সময়ে তিনি 'ইনস্টিটিউট অফ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স'-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত প্ল্যাঙ্ক বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। বার্লিনে থাকাকালীন পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর সেরা গবেষণাপত্রগুলি প্রকাশিত হয়।

প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব নিতে ভালোবাসতেন প্ল্যাঙ্ক। গবেষণার পাশাপাশি তিনি প্রশাসনিক কাজকর্ম সামলাতেন। ১৯১২ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল অবধি প্রায় ৩২ বছর ধরে প্ল্যাঙ্ক 'প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্'-এর অঙ্ক ও প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগের সচিব ছিলেন। তিনি 'জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটি'-এর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। দু'বারের জন্য তিনি সোসাইটির চেয়ারম্যান হন। পরবর্তীকালে এই সোসাইটির নামকরণ হয় 'ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি'। ১৯৩৭ সালে তিনি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেন। ১৯২৬ সালে প্ল্যাঙ্ক রয়েল সোসাইটির সদস্য (FRS) নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে রয়েল সোসাইটি প্ল্যাঙ্ককে কপ্‌লে পদকে ভূষিত করে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা আগেই বলেছি। প্ল্যাঙ্ক-ই প্রথম শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টাম-কণাধর্মী স্পন্দকের ধারণা দেন। শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টাম শক্তি তার কম্পাঙ্ক ও প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবকের গুণফল। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে আইনস্টাইন আলোক তড়িৎক্রিয়ার (Photo electric effect) ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেন। এর মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিকিরণের কণাধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ১৯০৫ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৩১ সালে আমেরিকার পদার্থবিদ আর ডব্লু উড প্ল্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো একটি অবিশ্বাস্য জিনিস আবিষ্কার করলেন কি করে। প্ল্যাঙ্কের উত্তর হলো— It was an act of desperation. For six years I had struggfled with the black body theory. I knew the problem was fundamental and I knew the answer. I had to find a theoretical explanation at any cost, except for the inviolability of the two laws of thermodynamics'। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকেই তৈরি হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। আইনস্টাইন, নীলস্ বোর, ব্রগলি, এস.এন. বোস, স্রোয়েডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক, ফের্মি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের হাতে বিকশিত হয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে তৈরি হয়েছে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের বিশাল ইমারৎ।

দিনগুলো ভালো যায় নি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের। সারাজীবন নিঃসীম বেদনার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। ১৯০৯ সালে প্ল্যাঙ্ক তাঁর প্রথম স্ত্রী মেরী মার্ক (Marie Merck) কে হারান। প্ল্যাঙ্কর প্রথ ম চার সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান কার্ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। দুই কন্যার মৃত্যু হয় প্রসূতি আগারে। ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বোমার আঘাতে প্ল্যাঙ্কের বার্লিনের বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। সব হারিয়ে প্ল্যাঙ্ক নিদারুণ দুর্দশায় পড়েন। বোমার আগুনে শেষ হয়ে যায় প্ল্যাঙ্কের গবেষণার যাবতীয় কাগজপত্র। বিজ্ঞান জগতের কাছে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। এখানেই শেষ নয়, ১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই হিটলারকে গুপ্ত হত্যা করার একটি চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। চক্রান্তের সাথে যুক্ত আছে এই সন্দেহে প্ল্যাঙ্কের পুত্র আইউইনকে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী হত্যা করে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক এই পদার্থবিজ্ঞানীর শেষ জীবন এমনি দুঃখ কষ্টে কাটে। ১৯৪৭ সালের ৪ অক্টোবর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের জীবনাবসান ঘটে।

— গোবিন্দ দাস (৯৩৩১৪১০৭৩৮)

"পরমাণু চুক্তি নয়, বোমা নয়, চাই নির্মল পরিবেশ ও নবীকরণযোগ্য শক্তি"

১৯৮০ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ রাজা রামান্না ঘোষণা করেছিলেন ২০০০ সালের মধ্যে সারা ভারতে ২০,০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি করা হবে। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় দৈনিক ও সাময়িকী পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল যে 'পরমাণু বিদ্যুৎ এবং আমরা' কলামে সস্তায় ও নিরাপদ হল পরমাণু বিদ্যুৎ। ১৯৮০ সালের পর বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে, সম্প্রতি সংসদে পরমাণু চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে। পরমাণু বিদ্যুতের চালচিত্র কেমন এই প্রশ্নটা অনেকদিন ধরেই মাথায় ঘোরাফেরা করছিল। খুব সম্প্রতি 'An International Journal of Nuclear Power' Vol (20) 2006, Vol (21) 2007 & Vol (22) 2008 হাতে এসেছে। 'Nu-Power' শিরোনামের এই জার্নালটি Nuclear Power Corporation of India (NPC) প্রকাশ করে থাকে। এই জার্নালের কয়েকটি তথ্য প্রথমেই জানিয়ে রাখছি —

(১) বর্তমানে সারা ভারতে মোট ১৭টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে যাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৪১২০ মেগা ওয়াট। আরো ৫টি কেন্দ্র চালু হলে ২৬৬০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। ২০২০ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

(২) কুন্দন কুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রজেক্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বায়ু বিদ্যুৎ (১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন) তৈরি করে পার্শ্ববর্তী কুন্দন কুলাম গ্রামে সরবরাহ করা হচ্ছে। যদিও নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে 'Nuclear Power' এবং 'wind power' এদের মধ্যে সহ অবস্থান। অথচ কুন্দন কুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রজেক্ট এখনো চালুই হয়নি। NPC -এর ঘোষণা অনুযায়ী :

২০০০ সালের মধ্যেই ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা, অথচ ২০০৮ সালে মাত্র ৪১২০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে তথ্য Nuclear Power Corporation বা NPC বা পরমাণু বিদ্যুৎ কর্পোরেশন পেশ করছেন তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

২০০৮ সালের ২৫ জুলাই খড়্গপুর আই আই টি-এর সমাবর্তন উৎসবে বর্তমান পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ার ম্যান জানিয়েছেন বিশ্বে জ্বালানির চাহিদা হু হু করে বাড়ছে, তাই শক্তি সমস্যার এক বড় সমাধান হল পরমাণু শক্তি। চেয়ারম্যান অনিল কাকোদার আরো জানিয়েছেন পরমাণু চুক্তির ফলে অতিরিক্ত ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে।

এবারে আসা যাক পরমাণু চুল্লী বা বিদ্যুৎ নিয়ে কি ঘটছে বা প্রকৃত তথ্যগুলি জেনে নেওয়া যাক —

(১) গত ২৮ বছর ধরে ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে মোট চাহিদার মাত্র ২.৬ শতাংশ পরমাণু বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে।

(২) ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর এখনো পর্যন্ত বিশ্বে নতুন কোন দেশ পরমাণু চুল্লী স্থাপন করেনি। শুধুমাত্র ভারত ও চীন পরমাণু চুল্লী স্থাপনে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

(৩) সারা বিশ্বে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা নিয়মিত ভাবেই ঘটে চলেছে। ১৯৫২ সালে কানাডার চক রিভার অঞ্চলে, ১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডের উইন্ড স্কেলে, ১৯৬১ সালে আমেরিকার ইজাহোর চুল্লীতে। পৃথিবীতে বর্তমানে কমবেশী ৫০০টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। বড়ো রকমের উল্লেখযোগ্য ১০০-র মতো দুর্ঘটনা ঘটেছে। ছোটোখাটো দুর্ঘটনা কয়েক হাজার। পরমাণু শিল্পের দুর্ঘটনা অন্যান্য যেকোনও শিল্পের দুর্ঘটনার থেকে গুণগতভাবে পৃথক। অন্যান্য শিল্পে দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষয়ক্ষতি সাধারণ মানুষকে বহন করতে হয় না। কিন্তু পরমাণু শিল্পে দুর্ঘটনা ঘটলে তার কুফল (ক্যানসার, লিউকোমিয়া সহ বিকলাঙ্গ শিশু, তেজস্ক্রিয়তার বিষ হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকে) সাধারণ মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরে বহন করতে হয়।

(৪) পরমাণু চুল্লীর বিপদগুলি (কুফলগুলি) পরিবেশে নানাভাবে বিপর্যয় ডেকে আনছে। যথা —

(ক) **তেজস্ক্রিয়তার বিষ** : পরমাণু চুল্লীর ৯টি পর্যায়-এর প্রত্যেকটি থেকেই নিয়মিতভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে পরিবেশে মিশছে। ফলে ক্যানসার, লিউকোমিয়া সহ দুরারোগ্য ব্যধি ও বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

(খ) **পরমাণু চুল্লীর উৎপাদন খরচ** : পরমাণু চুল্লী কেন্দ্র স্থাপনের খরচ নিয়ে ভারত সরকার বা NPC সংসদে কোন হিসাব আদৌ পেশ করেন না, শুধুমাত্র গবেষণা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক তথ্য থেকে জানা যায় একই পরিমাণ পরমাণু চুল্লী স্থাপনের খরচ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের খরচের থেকে প্রায় সাড়ে তিনগুণ। এছাড়া ৫০/৬০ বছর পরমাণু চুল্লীগুলির আয়ু শেষ হয়ে গেলে কবরস্থ করতে যা খরচ হয় তা প্রায় পরমাণু চুল্লী স্থাপনের খরচের সমান।

(গ) **উৎপাদন ক্ষমতা** : বার্ষিক 'নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা'র মাত্র ৩০ শতাংশ উৎপাদনে পৌঁছায়। এছাড়া উৎপাদনের সময়ের হার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের থেকে অনেক কম।

(ঘ) **তাপদূষণও জৈব বিবর্তনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ** : পরমাণু চুল্লী স্থাপনের ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা ও তেজস্ক্রিয়তা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা ও তেজস্ক্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকলে জীবজগতের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে নতুন করে সমস্যা তৈরি করবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। ইউরেনিয়াম মৌলকে যখন নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করা হয় তখন প্রতিটি ইউরেনিয়াম ভেঙে দুটি পৃথক মৌলে পরিণত হয়, এসময়ে ব্যাপক তাপ পার্শ্ববর্তী বায়ু, জলাশয়, নদী বা সাগরের জলে মিশে সামগ্রিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ এর মতো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতিনিয়তই পরিবেশের তাপমাত্রা ও তেজস্ক্রিয় দূষণ বেড়ে চলেছে। এই তেজস্ক্রিয় আবর্জনা পরিবেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এরপর ৮ পাতায়

বিচিত্র প্রাণী

১ পাতার পর

প্রাণী, পাখি, মুরগী বা ভেড়াও।

শৃগাল বাস করে সাধারণতঃ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে। এরা অত্যন্ত চতুর প্রাণী। ভারতের গ্রামে গঞ্জে এক অন্য প্রজাতির শৃগাল দেখা যায়। এরা দলবদ্ধভাবে ডাকে। কখনও কখনও একধরনের শৃগাল বাঘের আগমনও জানিয়ে দেয়। আর তার উচ্ছিষ্টও খেয়ে থাকে। এদের বলে ফেউ।

শিম্পাঞ্জি : বানর গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জিই অনেকটা মানুষের মত জীব। পূর্ণবয়স্ক শিম্পাঞ্জি প্রায় ১.৩ মিটার দীর্ঘ হয় আর সোজা হয়ে হাঁটতেও সক্ষম। এ সত্ত্বেও শিম্পাঞ্জি চারপায়ে ভর দিয়েই চলে। শিম্পাঞ্জির জন্ম আফ্রিকার জঙ্গলে। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে আর শিশু শিম্পাঞ্জির প্রতি স্নেহপ্রবণ ও যত্নবান। শিম্পাঞ্জি খেলতে ভালবাসে আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। পোষা শিম্পাঞ্জি মানুষের মতই ব্যবহার করতে পারে। এরা সাঙ্কেতিক শব্দ ও ভঙ্গীও বুঝতে সক্ষম। শিম্পাঞ্জিরা খুবই ছটফটে আর নানারকম শব্দ করতে থাকে। মানুষ দেখলেই এরা শান্ত আর চুপ করে যায়।

সালামান্ডার : একমাত্র পূর্ণগঠিত উভচর, যাদের সুগঠিত লেজ থাকে। এদের অনেক সময়েই গিরগিটি বলে ভুল হয়। গিরগিটি আসলে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। গিরগিটির দেহে আঁশ থাকে, সালামান্ডারের তা থাকে না। এদের শরীর আর্দ্র ও সিক্ত। এদের নখ থাকে না আর পায়ের পাতায় চারটি আঙুল থাকে। প্রায় ২৫০ প্রজাতির সালামান্ডার দেখা যায়। এদের দেখা যায় উত্তর গোলার্ধের কিছু জায়গায়। উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকায়।

অন্যান্য উভচর প্রাণীর মত স্যালামান্ডার আর্দ্রতা পছন্দ করে। এরা তাপ সহ্য করতে পারে না। এরা প্রধানত নিশাচর ও আমিষভোগী। ছোট ছোট প্রাণী ও ডিম খেয়ে জীবনধারণ করে। সালামান্ডারের শ্রবণশক্তি নেই কারণ এদের কানের পর্দা থাকে না। এরা মাটিতে কম্পন শুনে শত্রু বা খাদ্যের অবস্থান টের পায়। এরা দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফিট পর্যন্ত হয়।

সী-হর্স বা ঘোড়া মাছ : এক বিচিত্র জীব। এদের দেহ অত্যন্ত হাল্কা। এদের ঘোড়া-মাছও বলে কারণ এদের মাথা অনেকটা ঘোড়ার মতো দেখতে। এদের দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার।

সী হর্সের লেজ গোটানো থাকে, এর সাহায্যে এরা জলে ওঠানামা করে বা সাঁতার দেয়। পুরুষ ঘোড়া মাছ ডিম পাহারা দেয়। সামুদ্রিক আগাছার সঙ্গে এরা প্রায় লেগে থাকে। এদের দেখা যায় ক্রান্তীয় আর উষ্ণ এলাকার সমুদ্রে।

স্কাঙ্ক : বেজি প্রজাতির একধরনের প্রাণী। তিনটি প্রজাতির স্কাঙ্ক দেখা যায়। এদের কারও গায়ে চক্র বা ডোরা থাকে। এরা নিশাচর। ভয় পেলে এরা লেজের তলায় থাকা গ্রন্থি থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল ছিটিয়ে দেয়, যার গন্ধ বেশ কয়েকদিন থাকে। স্কাঙ্কের খাদ্য হল ইঁদুর, পাখির ডিম ও গাছের কচিপাতা ইত্যাদি। এরা উত্তর আমেরিকায় বাস করে।

সীল : সীল বা সীল লায়ন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের অধিকাংশই বরফ শীতল জলে বাস করে এবং বেশিরভাগ সময়ই সমুদ্রের জলে কাটায়। মাঝে মাঝে এরা জলের বাইরে এসে সূর্যের আলো উপভোগ করে। সীলের দেহ একটু চ্যাপ্টা আর পা হাঁসের পাতার মত জোড়া যা সাঁতারের উপযুক্ত। এদের শরীরে ত্বকের নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য। সীল মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের মাথার পাশে ছোট কান থাকে। দেহ লোমশ। পুরুষদের ঘাড়ে কেশরও থাকে।

স্পঞ্জ : খুবই সরল ধরনের জলজ প্রাণী। বেশিরভাগ স্পঞ্জ দেখা যায় উষ্ণ অঞ্চলের সাগর ও মহাসাগরে। এদের কিছু মিষ্টি জলেও বাস করে। স্পঞ্জের দেহ ছোট ছোট গর্ত নলে পূর্ণ জেলির মত নরম পদার্থে তৈরি। নলের মাথা উপরের দিকে থাকে। জলে মিশ্রিত অক্সিজেন এই জলের মধ্যে দিয়ে শরীরের নানা অংশে পৌঁছয়। এরা এইভাবেই শ্বাসগ্রহণ করে।

স্পঞ্জের মৃত্যু হলে এটি শুষ্ক হয়ে যায়। এই শুষ্ক স্পঞ্জ স্নানের সময় সাবান মাখতে ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ স্পঞ্জ পাওয়া যায় মেক্সিকো উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে। বর্তমানে অবশ্য কৃত্রিম প্লাস্টিকের স্পঞ্জ বানানো হয়।

স্টার ফিস বা তারামাছ : একধরনের জলজপ্রাণী। এরা সমুদ্রের তলায় বাস করে। বেশিরভাগ তারামাছের পাঁচটি বাহু থাকে যা অনেকটা চাকার ধারের মত মনে হয়। এরা মেরুদন্ডহীন হলেও শরীরের কাঠামো হাড়ের মতো শক্ত। নিচে থেকে ছোট্ট নলের মতো এদের পা বেরিয়ে আসে। তারামাছ ঝিনুকের মুখ খুলে খেতে পারে। ঝিনুকের খোলস এর বাহু বা পদের সাহায্যে খোলে। এরা পাকস্থলীর অর্ধেক অংশ, মুখ দিয়ে বের করতে পারে আর সেইভাবেই খাবার খায়।

সিন্ধু ঘোটক বা ওয়ালরাস : সামুদ্রিক প্রাণী। এর মুখের দুপাশে থাকা বিরাট খড়্গের মতো দাঁতকে, হাতির দাঁতের মতোই মনে হয়। এক একটি দাঁত প্রায় এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই দাঁতের সাহায্যে সিন্ধুঘোটক ঝিনুক, মাছ ইত্যাদি ছাড়িয়ে খেতে পারে। দাঁতের সাহায্যে এরা আত্মরক্ষাও করে। মেরু ভালুকরাও তাই এদের এড়িয়ে চলে।

ওয়ালরাস দেখা যায় আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় মেরু অঞ্চলের নিদারুণ ঠান্ডায়। এরা বিরাট আকারের প্রাণী। কোন কোন পূর্ণবয়স্ক সিন্ধুঘোটক দৈর্ঘ্যে ৪ মিটারও হয়। ওজন প্রায় ১৮০০ কিলোগ্রাম। দাঁত ও চামড়ার লোভে শিকারের ফলে সিন্ধুঘোটক বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন করে সিন্ধুঘোটক শিকার নিষিদ্ধ করা হয়।

— শৈবাল কুমার গুহ

পরিবেশ ও নবীকরণযোগ্য শক্তি''

৬ পাতার পর

(সারা বিশ্বে) শক্তি সমস্যার সমাধান গুলি কোন পথে ?

তাপবিদ্যুৎ-এর উৎস কয়লা (খনি থেকে পাওয়া যায়) এবং পরমাণু বিদ্যুৎ-এর ইউরেনিয়াম (খনি থেকে পাওয়া যায়) — উৎসগুলি কোন না কোনদিন শেষ হয়েই যাবে। অথচ পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎসগুলি ভবিষ্যতে কোনদিনই শেষ হবে না। বিকল্প শক্তি অর্থাৎ নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি যথা — বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, সৌর শক্তি, জৈব গ্যাস, সমুদ্রের তাপবিদ্যুৎ শক্তিগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক (জীবাশ্ম জ্বালানী) জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে।

সারা ভারতে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২.৬ শতাংশ মাত্র পাওয়া যায় পরমাণু চুল্লী থেকে (৪১২০ মেঃ ওয়াট)। উল্লেখ করা দরকার ভারতের রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার প্রজেক্ট ১ নং এবং ২ নং চুল্লী তৈরি করতে সময় লেগেছিল যথাক্রমে ৮ এবং ১০ বছর। চেন্নাই-এর কলাপক্কমে সময় লেগেছিল আরো বেশি যথাক্রমে ১৪ এবং ১১ বছর।

অথচ সারা ভারতে সূর্য (৫,৭০,০০০ মেঃ ওয়াট), বায়ুচালিত বিদ্যুৎ (৩০,০০০ - ৫০,০০০ মেঃ ওয়াট), জৈব গ্যাস (৪০,০০০ - ৬০,০০০ মেঃ ওয়াট), সমুদ্রের তাপবিদ্যুৎ (৫০,০০০ - ৭০,০০০ মেঃ ওয়াট), সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ (২০,০০০ - ৩০,০০০ মেঃ ওয়াট) এছাড়া সোলার হিটার, সৌর কুকার, সৌর সক্তির সাহায্যে নানা ধরনের বিদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় ৭০,০০০ মেঃ ওয়াট।

বিকল্প (নবীকরণযোগ্য শক্তি) শক্তির ব্যবহার ও সম্ভাবনা বাড়ছে

(১) বেঙ্গালুরুতে 'সোলার ইন্ডিয়া- ২০০৭' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রী জানিয়েছেন আগামী ৫ বছরে আরো ১২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্যবহার যোগ্য শক্তি সংস্থার (ওয়েব রেডা) অধিকর্তা জানিয়েছেন কয়েক বছরের মধ্যে ৮৭ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছবে, বহুক্ষেত্রেই (প্রায় ৫০ শতাংশ) বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে অপ্রচলিত শক্তি থেকে।

(২) ওয়েব রেডা ফেজার গঞ্জে ও সাগর দ্বীপে ২.৫ মেঃ ওয়াট (হাওয়া কল থেকে) বায়ু বিদ্যুৎ তৈরি করছে। মেদিনীপুরের (পূর্ব) কাঁথিতে ৬০ মেঃ ওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য জায়গায় সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

(৩) জোয়ার ভাঁটা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুন্দরবনে ৩.৭৫ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার কাজ চলছে। এই অঞ্চলে হাওয়া বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার সম্বাবনা যথেষ্ট রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বায়োমাস থেকে ১৫০ মেঃ ওযাট বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য ১০০০ কোটি টাকা লগ্নি করা হয়েছে।

(৪) আসানসোলে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। গ্রিডসিস্টেমের সাহায্যে যাতে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

(৫) পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ৯০০ মেঃ ওযাট পাম্পড স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ২০০৭ সালেই চালু হয়েছে।

বিকল্প শক্তিগুলির উৎসগুলিকে পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগাতে পারলে শক্তি সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা যায়।

— জয়দেব দে, ৯৪৭৪৩০০০৯২

হিরোসিমা দিবসের আহ্বান

৬ আগস্ট, ০৮ কোচবিহার : বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, কোচবিহার, বিজ্ঞান অন্বেষক ও শ্রুশ্রুত সেবা সংঘের উদ্যোগে হিরোসিমা দিবসে কোচবিহার কাছারী মোড়ে সারাদিন ব্যাপী পরমাণু চুল্লির বিপদ, বিশ্ব উষ্ণায়নের কুফল সহ পরিবেশ দূষণের বিষয়গুলি নিয়ে বিজ্ঞান কর্মীরা পোস্টার প্রদর্শনী ও আলোচনা করেন। 'কেন পরমাণু চুল্লি চাই না' শীর্ষক পরমাণু বই, বিজ্ঞান পত্রিকা, পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সহ প্রচারাভিযান চালানো হয়। বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের সম্পাদক শেখর ঘোষ জানান বিকল্প ও নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি যথা— জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, জৈব বিদ্যুৎ কাজে লাগাতে পারলে শক্তি সমস্যার সমাধান সম্ভব। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় — ৯ আগস্ট, ০৮ নাগাসাকি দিবসে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার দিনহাটা-বামনহাট ট্রেনে সারাদিনব্যাপী পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। পরমাণু চুল্লির বিপদগুলি যথা— (১) তেজস্ক্রিয় দূষণ হাজার হাজার বছর ধরে চলে। (২) তেজস্ক্রিয় দূষণে ক্যানসার, লিউকোমিয়া সহ বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম হয়, (৩) পরমাণু চুল্লির থেকে পরমাণু বোমায় মূল উপাদান প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়।

ড. গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাগমারি আমার সবাই ক্লাব এবং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২ আগস্ট বাগমারি-মানিকতলা সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনে প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ড. গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-র ১১৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ড. দেবীপ্রসাদ আচার্য (প্রধান শিক্ষক) এবং ড. দেবেশ দাশ (তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী)। সভার মূল বক্তা ছিলেন বিড়লা তারামণ্ডলের অধিকর্তা ড. দেবী প্রসাদ দুয়ারি। বিষয় — 'সৌরজগতের নতুন রূপ'

রিপোর্ট

গত ১৫-৮-২০০৮ তারিখে ৪২, বসন্ত বাবু রোড, কাঁচরাপাড়ার অ্যালবার্টস স্কুল হলে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার বার্ষিক সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল — বিজ্ঞান চেতনা বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা। আলোচনা সভায় যোগদান করেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞান সচেতন মানুষ ও বিজ্ঞান সংগঠনের বিজ্ঞান কর্মীরা। আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যা গরিষ্ঠ এইমত পোষণ করেন যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞানের আলোচনা, সীমায়িত ক্রমশ হ্রাসমান। বিজ্ঞান কর্মীদের কাছে এটা ভাবনার বিষয়। শেষ পর্বে 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকার পরিচালন সমিতি গঠিত হয়।

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ০৩৩-২৮৭৬০৭২০, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী— সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)*

***E.mail-* ganabijnan@yahoo.co.in**